# বৃত্ত

বাবুদের বাড়ি বাসনের পাঁজা মেজে ধুয়ে ঘরদোর ঝাঁটপাট সাঙ্গ করে ঘরে ফিরে চৌকাঠে পা দিয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল বাতাসির। ঘরের মানুষটা তখনো এক কোণে বসে বিড়ি ফুঁকে চলেছে একমনে। কাজে যাবার তোড়জোড়ের বাষ্পমাত্রও নেই হাবে ভাবে।

"ভোম মেরে বসে রয়েছ যে, ডিউটিতে যাবে না?"

বাতাসির সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে হরিদাস চোখ তুলে জুল জুল করে চেয়ে রইলো, কোন কথা না বলে। মেঝেতে ভিজে কাঁথা কাপড় লেপটে কচি বাচ্চাটা তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে।

বাতাসি ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে নিজের বুকে তার ক্ষুধার্ত মুখখানা গুঁজে দিয়ে হরিদাসের গা ঘেঁষে বসলো, "বলি হ্যাঁগা ব্যাপারখানা কি? কাজে যাবে না?"

হরিদাস তেমনি ঘোলাটে চোখে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তখনো। মায়ের সাড়া পেয়ে পরান, বদনা, পতিত, ফ্যাকাসি, দুলাল খেলা ছেড়ে তড়িঘড়ি পাশে এসে দাঁড়ায় - ক্ষিদেয় কখন থেকে পেট চুঁই চুঁই করছে তাদের, এবার তার একটা হিল্লে হবে এই আশায়।

বাতাসি আঁচলের গেরো খুলে গিন্নীমার দেওয়া রুটি দু'খানা সর্বজ্যেষ্ঠ পরানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, "যা ভাইবোনে ভাগ করে খা গে যা। গোল করিসনে।"

পরান ও তার পিছু পিছু বদনা-পতিত-ফ্যাকাসি-দুলাল ব্যগ্র ব্যস্ত পায়ে ঘরের বাইরে ছোট্ট আঙিনায় গিয়ে সেই স্বল্প প্রাতরাশের ভাগবাটোয়ারা এবং ভক্ষণে রত হল।

হরিদাস যেন এরই প্রতীক্ষায় ছিল।

ছেলেপুলেরা দূরে যেতেই বাতাসির সপ্রশ্ন দৃষ্টির পানে ভয়ভীত বিস্ফারিত দু'চোখ তুলে শুকনো গলায় বললো, "তিনকড়ি খালাস

পেয়েছে।"

এ কথায় ভীষণভাবে চমকে উঠলো বাতাসি।

দুগ্ধপানরত বাচ্চাটাকে দু'হাতে চেপে ধরে আর্তনাদ করে উঠলো, "কে? কে খালাস পেয়েছে?"

"তিনকড়ি। তোর মরদ। পরান বদনার বাপ।"

সকালে মোড়ের দোকানে বিড়ি কিনতে গেছিল হরিদাস। বিড়িওলা রতনলালই দিয়েছে খবরটা। তার ভায়রাভাই হাজারিবাগ জেলে সেপাই। সেই জেলেরই কয়েদি ছিল তিনকড়ি। ছাব্বিশ জানুয়ারী অনেককে খালাস করবে সরকার। তিনকড়ির নামও নাকি আছে লিস্টিতে। সে নিজে বলেছে রতনলালের ভায়রাভাইকে। বলেছে ডুমুরডিহিতে তার পরিবার আছে। খালাস পেলেই যাবে সেখানে ----।

যাবে অর্থাৎ আসবে। দশ বছর আগে এই ডুমুরডিহি থেকেই উধাও হয়েছিল তিনকড়ি। ভিন গাঁয়ে দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বলে সেই যে বেরুলো আর ফিরে আসেনি সে। কিছুদিন পরে তিনকড়ির রিক্সাওলা সাঙ্গোপাঙ্গোদের কাছে বাতাসি শুনলো ব্যাপারটা। তিনকড়িকে নাকি খুনের দায়ে হাজতে পুরেছে পুলিশ। সদরের কাছারিতে খুনের মামলা চলছে। বাতাসি প্রথমে বিশ্বাস করেনি কথাটা। অপোগণ্ড শিশু দু'টিকে নিয়ে সদর কাছারিতে হাজির হয়েছিল দেড়দিনের পথ পাড়ি দিয়ে। বহু কষ্ট সয়ে। কোমরে দড়িবাঁধা তিনকড়িকে দেখে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল বাতাসি, আর তিনকড়ি ধরা গলায় আদ্র লাল চোখে বলেছিল, "কাঁদিসনি বউ। আমি আবার ফিরে আসবো। পরান বদনাকে দেখিস।"

তারপর তাড়াতাড়ি চোখ মুছে সিপাইয়ের গুঁতো খেতে খেতে বন্ধ গাড়িতে গিয়ে উঠেছিল, বাতাসির অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টির আড়ালে।

এরপর বহুদিন ধরে চলেছে মামলার জেরবার এবং যথাকালে তিনকড়ির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের খবরটাও কানে এসেছে বাতাসির। এই হরিদাসই খবরটা এনে দিয়েছিল তাকে। সে-দিন আর নতুন করে কেঁদে ভাসায়নি বাতাসি। মানুষটা যাবার পর ক্রমাগত সংসারের রূপ চিনতে চিনতে আর আঘাত সইতে সইতে নতুন করে আহত হবার চেতনা

হারিয়ে ফেলেছিল। বিয়ে হয়ে এই বস্তিতে এসেছিল বাতাসি। এখানেই তিনকড়ির সঙ্গে ছ'বছর ঘর করেছে সে, সুখে দুঃখে আনন্দে উৎসবে অর্ধ-অনশনে। গাছ যেমন শক্ত শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে গর্বে মাথা তুলে বলে "এ আমার জমি," নববধূ কিশোরী বাতাসিও তেমনি ক্রমে ক্রমে সেই বস্তির সঙ্গে একাত্মা হয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় ঘরগেরস্তালির মাঝে ঢেলে দিয়েছিল নিজেকে।

হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় এসে প্রকাণ্ড গাছটাকে মূলসুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিলো। উপে গেল সব নিরপত্তা, সব নিশ্চিন্ততা। পরিচিত বিশ্বস্ত প্রতিবেশী পরিজনদের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটলো রাতারাতি। সবাই যেন মুখোশ খুলে নখ-দাঁত-থাবা বাগিয়ে নিরাবলম্বন নিরাশ্রয় বাতাসিকে গ্রাস করতে ছুটে এলো। সেই সব মাংসলোভাতুর মনুষ্যপশুদের মুহুর্মুহু আক্রমণে রক্তাক্ত জর্জর বাতাসি সেদিন স্তব্ধ নির্বাক হয়ে হরিদাসের বয়ে আনা দুঃসংবাদ শুনেছিল আবেগশূন্য মুখে। হরিদাসের কেমন মায়া হল।

পাশে বসে নরম গলায় শুধোলো, "কি করবি এবার?"

বাতাসি কি আর বলবে। এই একই প্রশ্ন অজস্রবার সে নিজেই করেছে নিজেকে। প্রশ্নটা পাষাণ প্রাকারের মত চারিদিক থেকে ঘিরে ধরেছে বাতাসিকে। পথরুদ্ধ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মাথা কুটেছে সে, এ প্রশ্নের সমাধান পায়নি।

বাতাসিকে নিরুত্তর দেখে ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে হরিদাসই সমাধান বাতলায় তাকে এবং শেষ অবধি ডুবন্ত মানুষের মত হরিদাসের প্রস্তাবের খড়কুটো আঁকড়ে ধরে ভেসে উঠতে চায় বাতাসি। পরান বদনার হাত ধরে হরিদাসের পিছু পিছু ডুমুরডিহির আর এক প্রান্তে আর একটি ছোট্ট কুটিরে এসে ওঠে। নতুন করে সংসার পাতে পুনর্বার। এক এক করে অনেকগুলো বছর কেটে যায়। নতুন শিশুদের আবির্ভাব ঘটে। ঝড়ে পড়া গাছটা নতুন জমিতে আবার ফলে ফুলে পাতায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। দুঃস্বপ্নময় অতীতকে মুছে ফেলতে চায় কিন্তু অতীত মোছে না ----।

হরিদাস নিঃশব্দে বিড়ি ফুঁকে যায়। বাতাসি নিথর হয়ে বসে থাকে। কোলের বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ে একসময়। পরান-বদনা-পতিত-ফ্যাকাসি-

দুলাল খেলার ফাঁকে এক আধবার ঘুরে যায় আরও কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। বাতাসি গ্রাহ্য করে না। শূন্য দৃষ্টি মেলে শুকনো মুখে বসে থাকে চুপচাপ। এইভাবে অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত লাফিয়ে ওঠে হরিদাস।

ফিসফিস করে বলে, "কাল ছাব্বিশে জানুয়ারী।"

বাতাসি ভয়ার্ত চাপা গলায় বলে, "চল এখান থেকে পালায়ে যাই। ও ছাড়বে না। নির্ঘাত খুন করে রাখবে।"

হঠাৎ ছোট্ট সংসারখানা জুড়ে দারুণ ব্যস্ততা দেখা যায়। পুরোনো মাদুর ছেঁড়া তোষক ডালাভাঙা বাক্স তোরঙ্গ থালাবাটি কাপড়চোপড় বাঁধাছাদা করে নিয়ে পথে নামে সবাই। হাঁটা পথে মাইলটাক গিয়ে স্টেশন। পশ্চিমগামী লম্বা একটা ট্রেন হুশ হুশ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ওদের নিয়ে পাড়ি দেয় কোন অজানা উজানে।

- ২ -

তিনকড়ির ডুমুরডিহি পৌঁছে বাতাসির খোঁজ খবর সংগ্রহ করতে আরও কিছুদিন লেগে গেল। জেলখাটা রিক্সাওলার পরিবার নিয়ে কারই বা এমন মাথাব্যথা! দশ বছর আগেকার সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গী সাথীদের বিশেষ কেউই এখন আর নেই এ এলাকায়। পেটের ধান্দায় এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া খুব একটা দলবাজ লোক ছিল না তিনকড়ি। সারাদিন রোদে জলে রিক্সা টানতো। দিনশেষে মালিককে দৈনিক ভাড়া গুনে দিয়ে উদ্বৃত্ত পয়সা কটা নিয়ে বাড়ি ফিরতো বউ ছেলেদের কাছে। ফেরার পথে চাল, আটা, গুড়, সব্জিপাতি কিনতো - যে দিন যে রকম - ট্যাঁকের অবস্থা বুঝে। বউ কাঠকুটো জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিত তড়িঘড়ি। বাচ্চাদুটোকে খেলা দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তিনকড়ি বউকে গল্প শোনাতো সারাদিনের নানা অভিজ্ঞতার। বউ আধকাঁচা কাঠের ধোঁয়াটে উনুনে ফুঁ দিতে দিতে কৌতুকদীপ্ত মুখে নির্বাক শুনে যেত সে সব গল্প।

ছোট্ট শহর ডুমুরডিহি, শহরতলীই বলতে গেলে। খুব একটা পয়সাওলা জায়গা নয় বড় ঘিঞ্জি শহরগুলোর মত। পয়সা রোজগারের পথও সংকীর্ণ। তিনকড়ি ট্রেনের টাইম মাফিক স্টেশনে হাজিরা দেয় তিন

বেলা। দু'চারজন সওয়ারী জুটে যায়; কেউ চড়ে একক কেউ বা ভাগেজোগে। অন্য সময় বড় রাস্তার মোড়ে রিক্সা নিয়ে বসে থাকে আরোহীর প্রতীক্ষায়। ডুমুরডিহির অন্য রিক্সাওলারাও থাকে সেখানে। রিক্সাগুলো লাইনে খাড়া করিয়ে নিজেরা তাসের পাতা বিছিয়ে বসে ছায়াঘেরা ফুটপাতে। নানারকম ঠাট্টামস্করায় আড্ডা সরগরম হয়ে ওঠে।

না, কোনরকম নেশাভাঙ-বদ অভ্যাস ছিল না তিনকড়ির। খেটে খাওয়া মানুষটা খাটতেই জানতো শুধু আর সর্বদা মাথা খাটাতো আরও উপার্জনের আরও পরিশ্রমের ফন্দিফিকিরে। সংসার বলতে বউ বাতাসি আর কচি বাচ্চাদুটো। আর ছিল এক বিধবা দিদি। স্বামীর গাঁয়ে ভিটে আগলে পড়ে থাকতো। মাঝে মধ্যে তিনকড়ি যেতো দিদির খোঁজখবর নিতে। কাপড়চোপড় পয়সাকড়ি সামান্য কিছু দিয়ে আসতো দুখিনী দিদিকে। এ-নিয়ে বাতাসি কিছু বলেনি কোনদিন। তিনকড়ি যে দিদিকে এনে নিজের সংসারে পত্তন করেনি তাতেই সন্তুষ্ট ছিল বাতাসি। বয়সে কিছু বড় এই রাশভারী ননদকে মনে মনে একটু ভয়ই করতো সে।

তিনকড়ির উপার্জনে কোনরকমে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলতো। এত খাটাখাটনি করেও সচ্ছলতা ছিল না। যা টাকা পেতো তার থেকে বাঁধা ভাড়া গুনে দিতে হত রিক্সার মালিককে। সওয়ারী বেশী হোক কম হোক, কি একেবারেই না হোক, এক পয়সা এদিক ওদিক করা চলতো না তাতে। নিজের রিক্সা হলে ওটা হয় না। মেহনতের কড়ি সবটাই হাতে পায় তবে। এই এক গভীর দুঃখ ছিল তিনকড়ির, নিজস্ব একটা রিক্সা না থাকার দুঃখ। অথচ এ দুঃখ কোনকালে যে ঘুচবে সে সম্ভাবনার ছিটেফোঁটাও ছিল না কোথাও। অতএব এ টানাটানির ঘানি টানা থেকে মুক্তির পথও না ----।

সেবার বর্ষাকালে হঠাৎ দিদির গাঁ থেকে খবর এলো ওর দিদি সুকুমারী নাকি ভারি অসুস্থ। ভাইকে একবার শেষ দেখা দেখতে চায়। খবর পেয়েই আকুলিবিকুলি হয়ে ছুটলো তিনকড়ি। ট্রেনে বাসে দেড় দিন কাটিয়ে হাঁটাপথে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে দিদির বাড়ি পৌঁছে দেখলো সুকুমারীর সত্যিই ভারি দুর্দশা। পুরোনো জরাজীর্ণ বাড়ি ঘর ধ্বসে পড়েছে, কোনরকমে একখানা চালাঘরে মাথা গুঁজে আছে সুকুমারী আর তার ননদ অন্নপূর্ণা। মা-মরা মেয়েটা ছোটবেলা থেকে সুকুমারীর

কাছেই মানুষ। সুকুমারীর নিজের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। অন্নপূর্ণাকেই সন্তান স্নেহে মানুষ করেছে এতকাল। দিদির দুর্দশা দেখে অভিভূত হল তিনকড়ি। কিন্তু সেও সামর্থ্যহীন এখন। বর্ষাকাল রিক্সাওলাদের পক্ষে দারুণ অকাল। সওয়ারী মেলে কম। অথচ রিক্সার মালিক নিজের রেট কমাবে না এক চুল। এ ছাড়া জলে ভিজে অসুখ-বিসুখ লেগে থাকে প্রায়ই, রোজদিন কাজে বেরোতে পারে না। আধপেটা খেয়ে দিন কাটে বউ-বাচ্চাদের। সুকুমারীর ভাঙা ঘর মেরামত করিয়ে দেবার ক্ষমতা তার নেই। ডুমুরডিহিতে ফিরে হয়তো দেখবে ঘটিবাটি সব কিছু বেচে দিয়ে বসে আছে বাতাসি পেটের জ্বালায়।

সুকুমারী তিনকড়িকে আশ্বস্ত করলো। বললো সে কোন কিছুর প্রত্যাশায় ডেকে পাঠায়নি তাকে। ভাইকে জন্মের শোধ চোখের দেখা দেখতে চেয়েছে একবার। ভিটের দশা দেখে ঘাবড়াচ্ছে তিনকড়ি। আসলে সুকুমারীর শরীরের অবস্থা তার চেয়েও মারাত্মক। বাইরে থেকে বোঝা যায় না বটে। নেহাৎ মনের জোরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে সে। মনের জোরেও ততটা নয় যতটা কর্তব্যের খাতিরে। তার শেষ ঐহিক কর্তব্যটুকু সম্পন্ন না হলে যে মরেও শান্তি পাবে না সে। ভাইয়ের দু'হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে সুকুমারী।

তিনকড়ি ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ওঠে, "কাঁদিসনে দিদি, কাঁদিসনে।"

আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে সুকুমারীর শোক। অন্নপূর্ণা শুকনো মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুকুমারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "ওই মেয়েটাকে দেখেছিস? পেটে ধরিনি, বুকের দুধ দিইনি শুধু। এই এতটুকু থেকে বড় করলাম, ভেবেছিলাম দেখেশুনে ভাল ঘরে বিয়ে দোব। তা গরীবের কোন কথাটাই বা ভগবান শোনেন? এই যে মরতে বসেছি তবু ওর চিন্তাই বুকের মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছে অহোরাত্রি ----।"

বলতে বলতে সুকুমারী আবার তিনকড়ির হাত দুটো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরলো, "ভাইটি আমার, তোর পায়ে পড়ি, আমার শেষ কথাটা রাখ। ওই মেয়েটার একটা গতি করে দিয়ে যা তুই। দেশে গাঁয়ে একা একটা অরক্ষণীয়া মেয়ে একেবারে আতান্তরে পড়বে। শেয়াল কুকুরে জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে ওকে। তুই শুধু ওর সিঁথিটুকু ভরে দিয়ে যা। তোর কোন ভয় নেই, ও কোনদিন তোর দোরে গিয়ে দাঁড়াবে না কোন কিছুর প্রত্যাশায়। আমি এই তোকে ছুঁয়ে বলছি ----।"

তিনকড়ি হকচকিয়ে যায় এই অদ্ভুত প্রস্তাবের আকস্মিকতায়। কোন কথা জোগায় না মুখে। তারপরও নির্বাক বসে থাকে অনেকক্ষণ। তার মনের মাঝে নানারকম বাদপ্রতিবাদ চলতে থাকে নিঃশব্দে।

মন বলে, "ছি ছি, তা কখনো হয়?"

আবার মনই বলে, "কেন, ছিছিটা কিসের? হবে না কেন?"

"বাতাসি যদি টের পায়?"

"দূর, টের পাবে কি করে?"

বিবেক কখনও তাকে বোঝায় এ অন্যায়, বাতাসির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আবার বিবেকই তাকে বোঝায় - আহা, দুঃখিনী দিদির এত কষ্ট। তার ভাঙা ঘর সারাতে না পারুক, তার নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরোতে না পারুক অন্ততঃ মনের শান্তি যখন দিতে পারে তিনকড়ি সেটুকুতে তাকে বঞ্চিত করাও তো চরম স্বার্থপরতা, পরম নিষ্ঠুরতা। তিনকড়ি নির্বাকই থাকে এরপর।

সুকুমারী যা পারে জোগাড় যন্তর করে। তারপর গাঁয়ের পুরুতঠাকুর এসে গাটছড়া বেঁধে দেয় বর-বধূর। অন্নপূর্ণার সিঁথি ভরে মোটা করে মেটে সিঁদুর পরিয়ে দেয় তিনকড়ি। সুকুমারী সানন্দে আনন্দাশ্রু মোছে।

এবার তিনকড়ির বাড়ি ফেরার পালা।

সুকুমারী আঁচলে চোখ মুছে বলে, "আর দুটো দিন থাক ভাই। আর তো দেখতে পাবো না তোকে। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোর জামাইবাবু ডাকছে আমায়। যে কাজের জন্যে আটকে পড়েছিলাম এতদিন, তাও চুকেবুকে গেল। আর কোন দুঃখ নেই আমার। শুধু ভগবান যদি ক্ষুদকুঁড়ো কিছু দিতেন মেয়েটার কোলে। এই অল্প বয়েস, কি নিয়ে যে কাটাবে সারাটা জীবন ----।"

তিনকড়ি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

আরও দিন আষ্টেক সেখানে কাটিয়ে ডুমুরডিহি অভিমুখে রওনা দিলো তিনকড়ি। অর্ধেক পথ ট্রেনে গিয়ে তারপর বাস। বাসস্টপে পৌঁছে

শুনলো সকালের বাস চলে গেছে, পরের বাসটা আসতে বেলা দুপুর হয়ে যাবে, তাও যদি ঘড়ি ধরে আসে। এ সব দিকে বাস-টাস ঘড়ির তোয়াক্কা করে না কস্মিন কালে। পুঁটলি ঘাড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলো সে। পেশাদার রিক্সাওলা। চালকের সীটে বসে কত সওয়ারীকে পৌঁছে দিয়েছে তাদের আস্তানায়, বাস চালকের মর্জির অপেক্ষায় হা পিত্যেশ করে বসে থাকতে পিত্তি জ্বলে যায় তার। তবে ডুমুরডিহি এখনও বহু ক্রোশ দূরে। মাঠ-ঘাট খানা-ডোবা পেরিয়ে। অতদূর হন্টন দেওয়া মুখের কথা নয়। তবু তিনকড়ি ঘাবড়ায় না। পুঁটলি কাঁধে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে।

বাড়ি পৌঁছতে যেন আর তর সয় না তার। এতদিন যে স্বপ্ন আলেয়ার মত দূর থেকে হাতছানি দিতো সেই অসম্ভাব্য আশা মূর্ত হতে দেরী নেই আর। এতদিনে তিনকড়ি মালিকের চঙ্গুলমুক্ত হবে। নিজের রিক্সা হাঁকিয়ে পয়সা কামাবে দু'হাতে, অন্য কারও তোয়াক্কা না করে। কামিজের নীচে কোমরে গোঁজা ছোট্ট পুঁটলিটায় সস্নেহে হাত বোলালো সে। তারপর আবার জোরে পা চালিয়ে দিলো। আসার আগে দিদি ওর হাতে তুলে দিয়েছিল অন্নপূর্ণার স্বর্গতা মায়ের সোনার নাকছাবি আর কর্ণফুল, রূপোর হাঁসুলি, আর মল। এবং পঞ্চাশটা টাকা। গরীবের ঘরে এটুকু সম্পদ বহু কষ্টে বহু যত্নে আগলে রেখেছিল সুকুমারী নিজেদের বঞ্চিত করে। অন্নপূর্ণার বিয়ের যৌতুক হিসেবে। ভাইয়ের আর্থিক দুর্দশার কথা শুনে কিংবা তার বিক্ষত বিবেকের প্রলেপ হিসেবে দিদি বিদায় কালে তার হাতে এগুলো তুলে দিলো কিনা জানে না তিনকড়ি।

এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করেছিল সে। দুর্বল গলায় শুধিয়েছিল, "তোদের চলবে কি করে?"

দিদি কৃত্রিম লঘু কন্ঠে বলেছিল, "সে তুই ভাবিস নে। এতকাল তো চলেছে, তেমনি ভাবেই চলবে। দেশে গাঁয়ে সমাজ আছে, পাড়াপ্রতিবেশী আছে। দুটো পেট চলে যাবে। অন্নর বিয়ে দিতে পেরেছি, এখন আর কাউকে ডরাই না আমি ----।"

অন্নকে যার হাতে সঁপে দিয়ে এত নিশ্চিন্ততা দিদির, সে মানুষটারও যে অন্নর প্রতি কিছু কর্তব্য আছে সে কথা তিনকড়ির মাথায় একেবারেই যে গজায়নি তা নয়। কিন্তু সে ক্ষণকাল মাত্র। তারপর সর্বগ্রাসী যে চিন্তা তার সারা মন ঘিরে ধরেছে তা হল একটা নিজস্ব সাইকেল রিক্সার

প্রলোভন। আনকোরা নতুন, কিংবা অল্প একটু ব্যবহৃত। নতুন রিক্সার দাম জানে তিনকড়ি। কিন্তু দিদির দেওয়া জিনিসগুলোর সঠিক দাম জানে না এখনও। ডুমুরডিহি ফিরে কালই ওগুলো দোকানে নিয়ে গিয়ে যাচিয়ে বাজিয়ে বেচে ফেলার ব্যবস্থা করবে ----।

তিনকড়ি হাঁটছে তো হাঁটছেই। ক'ক্রোশ পাড়ি দিয়েছে হিসেব নেই তার। মাঝে মাঝে দোকানে বাজারে পথ শুধিয়ে নিচ্ছে। পথ অবশ্য তার অজানা নয়। বহুবার আসা যাওয়া করেছে এ পথে। তবু পদব্রজে এই প্রথম। তারাবল্লভপুরের পর সোজা বড় রাস্তা চলে গেছে। সেই কোন বাদশা কবে বানিয়েছিল বহু বছর আগে। সেই পথ ধরে চললে ডুমুরডিহি কেন একেবারে দিল্লী অবধি পৌঁছনো যায়। অবশ্য হেঁটে ডুমুরডিহি অবধি যাওয়ার সাধ আর নেই তিনকড়ির।

সকালের মনের জোর অনেকখানি ঝিমিয়ে এসেছে, তাছাড়া বাড়ি ফেরার তাড়াও রয়েছে তার। সারা সকাল পা চালিয়ে দুপুর তক্ রাস্তার আধাআধিও মেরে আনতে পারেনি এখনও। আর এখন তো সুয্যিদেব মাথার উপর, পা জোড়া টনটন করছে, হাঁটার গতিও কমে আসছে ক্রমে। তিনকড়ি গাছতলায় গামছা বিছিয়ে বসলো। নতুন গামছা, বিয়ের পাওয়া। বিয়ের ধুতিখানা আনতে সাহস করেনি তিনকড়ি। বাতাসি যদি ধরে ফ্যালে নতুন ধুতি দেখে। গামছাখানা এনেছে শুধু। গরীব হোক যা হোক শখ করে ভাইকে একখানা গামছা কিনে দেবার সামর্থ্য কি থাকতে পারে না দিদির? এ নিয়ে বাতাসি কিছু বলতে সাহস করবে না, খুশিই হবে বরং টানাপোড়েনের সংসারে এই সামান্য গামছাখানার আমদানিতে।

চিঁড়ে আর আখের গুড় সঙ্গে দিয়েছিল দিদি। তিনকড়ি গাছতলায় বসে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলো। তারপর গা এলিয়ে ট্যাঁক থেকে বিড়ি দেশলাই বার করে ধরালো। দেশলাই ফেরৎ রেখে কোমরে বাঁধা পুঁটলিটায় সস্নেহে হাত বোলালো আবার। তারপর চোখ বুঁজে বিড়িতে সুখটান লাগালো কষে। না, আর হাঁটাহাঁটি করবে না তিনকড়ি। গতরে সইবে না তার। ডুমুরডিহির বাস এই রাস্তা দিয়েই যাবে। এখানেই বাস ধরবে সে। অবশ্য সকালের পরিশ্রমটা একেবারে মাঠে মারা যায়নি। বাসভাড়া কিছুটা কম লাগবে এখন। বাসভাড়া বাবদ অন্ততপক্ষে টাকা দেড়েকের মত বাঁচিয়েছে সে। দেড়টা টাকা নেহাৎ ফ্যালনা নয় তার

কাছে।

তিনকড়ি ঘুমোয়নি, আধবোঁজা চোখে বিড়ি খেতে খেতে সুখস্বপ্নে মগ্ন হয়েছিল। আগামী দিনের সচ্ছলতার ছবির ফাঁকে ফাঁকে গত ক'দিনের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলো আবেশে বিভোর করে তুলছিল তাকে। কালো কালো ডাগর দুটি চোখের সলাজ চাউনি আর নিটোল নরম উষ্ণ দেহের পরশ থেকে থেকেই মনে পড়ছিল তার। নতুন রিক্সাখানা কিনে ফেলে অবস্থাটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে আবার খেজুরি গাঁয়ে দিদির খোঁজখবর নিতে যাবে তিনকড়ি, গাছতলায় নতুন গামছায় গা এলিয়ে মনে মনে সেই সঙ্কল্পই করছিল এমন সময় হঠাৎ দুচোখ খুলে গেল তার।

ষণ্ডামার্কা দুটো লোক হুমড়ি খেয়ে এসে বসেছে তার কাছে, একেবারে গা ঘেঁষে। তিনকড়ি তেরিয়া হয়ে গুটিয়ে নিলো নিজেকে, গামছাসুদ্ধু সরে এলো খানিকটা। লোকদুটো আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

"মাচিস বা রোউয়া ভিরি?"

তিনকড়ির হাতের বিড়ি তখনও নেভেনি, মাচিস নেই তাই বা বলে কি করে। অগত্যা কামিজ তুলে ট্যাঁক থেকে দেশলাই বার করে ওদের দিকে এগিয়ে দিলো। ষণ্ডাদুটোর চোখে চোখে কি যেন ইশারা হয়ে গেল। মুহূর্তে তিনকড়ির ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একজন। পেটকোঁচ থেকে পুঁটলি নিয়ে অন্যজনের হাতে দিতেই লোকটা পুঁটলি নিয়ে দে ছুট। প্রথম লোকটাও তিনকড়িকে ছেড়ে ছুট লাগাতে যাবে তিনকড়ি মাটিতে পড়া অবস্থাতেই দু'হাত দিয়ে তার পা চেপে ধরলো আচ্ছা করে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল লোকটা। তিনকড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোৎ করে লাথি মারলো তার পেটে। রিক্সা চালিয়ে খেতে হয় তাকে, আর কিছু না থাক পায়ের জোর আছে। তার লাথি খেয়ে ষণ্ডামার্কা দু'হাতে পেট চেপে ধরলো। তিনকড়ির মনে সাহস ফিরে এসেছে ততক্ষণে। তাছাড়া পুঁটলি হারিয়ে তার অবস্থা তখন সন্তানহারা বাঘিনীর মত। দমাদ্দম লাথির পর লাথি চালিয়ে গেল দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। কখনো তলপেটে কখনো বুকে কখনো মুখে। ক্রমাগত লাথি বর্ষণ করে যখন সে থামলো ততক্ষণে তার চারিদিকে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। তারাই থামালো তাকে। ষণ্ডামার্কার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেছে তখন।

তিনকড়ির পালাবার কোনও পথ রইলো না। এমন কি সে যে দিনে দুপুরে একটা গাঁট্টাগোট্টা জোয়ান লোককে অমন ভাবে লাথি মেরে শেষ করলো কি কারণে তারও কোন সদুত্তর দিতে পারলো না সে। শুরুতে অবশ্য বলেছিল যে লোকটা তার জিনিসপত্র চুরি করে নিজের সঙ্গীকে পাচার করেছে এবং সেই রাগে সেই দুঃখেই চোরটাকে ধরে ঠেঙিয়েছে সে। কিন্তু তার এ বক্তব্য ধোপে টিকলো না। কারণ স্বভাবতই প্রশ্ন উঠলো কি সেই জিনিসপত্র আর প্রশ্নটা শুনেই চুপ মেরে গেল তিনকড়ি, আর মুখ খুললো না মোটে। এতেই মামলা কেঁচে গেল তার। একটা হাভাতে কড়িকপর্দকহীন মানুষের কি সম্পত্তি হরণ করতে পারে চোরে, এমন মানুষের কাছে চোর আসতে যাবেই বা কি কারণে? অন্য তরফে খানাতদন্তে প্রকাশ পেলো যে মৃত লোকটা একটা বাজে বদমাশ। পুলিশ অনুমান করলো তিনকড়িও হয়তো ওদেরই দলভুক্ত ছিল এককালে। কালে কালে শত্রুতা গড়ে উঠেছে কোন কারণে এবং তারই ফলে এই হত্যা। তা সে হত্যার কারণ যাই হোক না কেন, তিনকড়ি হত্যা যে করেছে সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বিশ তিরিশজন মানুষ স্বচক্ষে দেখেছে তাকে। কাজেই তিনকড়ি শাস্তি এড়াতে পারলো না। ফাঁসির দড়িতে যে তাকে ঝুলতে হয়নি সেই ঢের। জজসাহেবের দেওয়া আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ মাথায় করে জেলে ঢুকলো তিনকড়ি।

দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে যে দু'চারটে বাসনকোসন বাড়িতে ছিল সেগুলো তখনও আছে না কি এরই মধ্যে বেচেবুচে খেয়েছে বাতাসি সে খবরটুকুও জানা হল না তার। অবশ্য থাক না থাক এমন কিছু ইতরবিশেষ হত না তাতে। দুটো বাচ্চাসমেত বউটা ওই দু'খানা ঘটিবাটির ভরসায় যাবৎকাল কাটাতে পারতো না কিছুতেই। শেষ অবধি বাতাসি কি করে জীবন যাপন করলো, পরান বদনার কি হল, জেল খাটার সুদীর্ঘ বছরগুলোয় বহুবার একথা ভেবেছে তিনকড়ি। ভেবে ভেবে কিছুতেই কিনারা করতে পারেনি। এবং দশ বছর পর সেই একই প্রশ্ন বয়ে নিয়ে ডুমুরডিহিতে এসেছিল পরিবারের খোঁজে। খুঁজে-পেতে পরিবারকে না হোক তাদের সংবাদ পেয়ে গেছিল ঠিকই এবং সংবাদটা সংগ্রহ করে সোজা ইস্টিশানে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়েছিল। ট্রেনে এবং বাসে সারাটা রাস্তা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দেওয়া শরীরটা তার থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। জ্বরজারি কিংবা আরও গভীর কোন যাতনায় কে জানে।

## - ৩ -

খেজুরিতে বিরাট কোন প্রত্যাশা নিয়ে যায়নি তিনকড়ি। এতকালের বিয়ে করা বউ, তার দুই ছেলের মা, সেই যখন অন্যের ছেলেমেয়ে কোলে-কাঁখে পেটে নিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে ঘরসংসার করতে পেরেছে তখন তাবৎ বিশ্ব-সংসারে আর কারই বা ভরসা তিনকড়ির। এক দিদি ছিল। সে কি আর এত বছর পরেও টিকে আছে, নিশ্চয় কবে মরে হেজে গেছে। সত্যিই তাই। সুকুমারী মারা গেছে তিনকড়ির খেজুরি ত্যাগের অনতিকাল পরেই। তবে অন্নপূর্ণা আছে। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর পরে সুকুমারীর ভাঙা ভিটে কামড়ে পড়ে আছে আজও। মুড়ি ভেজে, ঘুঁটে পেড়ে, কাঠকুটো কুড়িয়ে বেঁচে আছে কোনমতে। চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে, দুই গাল চুপসে কোটরগত, অভাব অনটনে হাড্ডিসার রোগা জিরজিরে শরীর - তবু তাকে চিনতে পারলো তিনকড়ি। অন্নপূর্ণারও তিনকড়িকে চিনতে দেরী হল না। তবু তার অপ্রত্যাশিত আগমনে কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছিল সে। কেবল মুহূর্তকাল। তারপর জিভ কেটে ঘোমটা টেনে এগিয়ে এসেছিল।

পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল, "বোস, তোমার খাবার আনি।"

চটা ওঠা থালায় পরম যত্নে মুড়ি আর উঠোনের গাছ থেকে ছেঁড়া চকচকে তাজা গোটাকয়েক কাঁচালঙ্কা এনে সামনে রেখে সঙ্কুচিত গলায় বলেছিল, "তেল তো ঘরে নাই।"

দিদির রেখে যাওয়া জরাজীর্ণ ভিটে আর দিদিরই একান্ত নির্বন্ধে দশ বছর আগে গোপনে বিয়ে করা বউ নিয়ে আবার নতুন করে সংসার পাতলো তিনকড়ি। জীবনের পাথেয় হিসেবে ওইটুকু যে পেয়েছে, বিধাতা যে একেবারে বঞ্চিত করেননি তাকে এ জন্য মনে মনে অসংখ্য প্রণিপাত করলো তাঁকে।

রিক্সাওলা তিনকড়ি এবার জনমজুর হল। ভোরবেলা দু'খানা রুটি খেয়ে গামছায় আরও দু'খানা রুটি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পরে রুজির সন্ধানে। সারাদিন গতর খাটিয়ে পরিশ্রমের কড়ি নিয়ে বাড়ি ফেরে সেই

সন্ধ্যেরাত্তিরে। ফেরার পথে চাল আটা তরকারীপাতি কিনে আনে। অন্ন কাঠকুটো ধরিয়ে রান্না চড়িয়ে দেয়। অদূরে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে বিড়ি খেতে খেতে এটা ওটা সেটা গল্প করে তিনকড়ি। অন্ন উনোনে হাওয়া দিতে দিতে নিবিষ্ট মনে শোনে। মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় তিনকড়ি। কিসের যেন একটা অভাব অনুভব করে সে। একটা বেদনার রেশ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। সন্ধানী চোখে অন্নপূর্ণার শরীরটাকে আঁতিপাতি করে দেখে। মনে মনে কি যেন হিসেব করে। নাঃ, একেবারেই নিপাট বাঁজা মেয়েমানুষ। আর ছেলেপুলে হবার আশা নেই তিনকড়ির। অন্ততঃ অন্ন তাকে সন্তান দিতে পারবে না কোনকালে। হ'বার হলে সেই সেবারই ছেলেপুলে হতে পারতো ওর, যখন দিদির কথায় আরও আট দশ দিন খেজুরিতে থেকে গেছিল তিনকড়ি। কিন্তু অন্নর শূন্য কোল পূর্ণ হয়নি, সে কপালই করেনি সে। এখন এই বুড়োটে বয়সে সে যে নতুন করে মা হবে এমন উদ্ভট আশা আর করে না তিনকড়ি। তাই বুকের একটা অংশ তার খালিই থেকে যায়। রন্ধনরত অন্নপূর্ণার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বহু পুরোনো স্মৃতি সব মনে পড়ে যায় আর তিনকড়ির বুক জুড়ে হাহাকার জাগে।

আরও ক'বছর কেটে গেল। খেটে খাওয়া মানুষ তিনকড়ি। ধনী হোক গরীব হোক সবাইকেই একটা পেট আর এক জোড়া হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন ভগবান। হাত দুটোকে খাটাতে জানলে একখানা পেট চলে যাবেই কোনমতে। তিনকড়ির বয়স বেড়েছে, তবু মেহনত করার ক্ষমতা কমেনি। জোয়ান বয়সের সেই মাংসপেশীর জোর হয়তো নেই কিন্তু তা পুষিয়ে নিয়েছে অভিজ্ঞতায়, নমনীয়তায়, ধৈর্যে। কাজের লোক হিসেবে নাম ডাক আছে তার। বাঁধা ঘর থেকে কাজেকর্মে ডাক আসে নিয়মিত। তিনকড়িকে পাওয়া গেলে আর অন্য লোক চায় না কেউ। তবে ইদানীং তিনকড়ি আর মজুরের কাজে যায় না বড় একটা। বিশেষ পুরোনো এক আধ বাড়িতে নেহাৎ খাতির করেই কখনো সখনো কাজকর্ম করে দেয়। নতুন পেশা ধরেছে তিনকড়ি। জমানো কড়ি ভাঙিয়ে গাভিন গাই কিনেছিল। সেই গাই বাছুর দিয়েছে। এখন তিনকড়ি গোয়ালা। দুধের কেঁড়ে নিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ বিলি করে।

সম্প্রতি সাইকেল কিনেছে। মফঃস্বলেও গ্রাহক আছে তার। দুধ বিক্রীর টাকাতেই সাইকেল কিনেছে। ভিটেখানা মেরামত করে নিয়েছে

আগেই। বাড়ির লাগোয়া জমিতে বাগান আছে। শাকসবজি কলাটা মূলোটা যা হয় তাতে নিজেদের চলে গিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে কিছু। অন্নপূর্ণা শাক-তরকারী, ফলমূল তুলে ঝুড়ি বোঝাই করে। হাটবারে হাটে গিয়ে বেচে আসে তিনকড়ি। এতকাল পরে এই প্রৌঢ়ত্বের কূলে এসে সচ্ছলতা এসেছে তার জীবনে, দু'পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছে তিনকড়ি। কিন্তু সর্বাঙ্গ সুখী হতে পারে না কিছুতেই। মনটা হুহু করে ওঠে থেকে থেকে।

পীরপুরে হাট বসে প্রতি শনিবার। তৈজসপত্র কাপড়চোপড় কাঁচা আনাজ খাটপালঙ্ক এমন কি গরু ছাগলও বেচতে আসে লোকে দূর দূরান্ত থেকে। শীত এসে গিয়েছে। কিছু তুলো কেনার প্রয়োজন পড়লো তিনকড়ির। পুরোনো কাঁথা বালিশ লেপ তোষক সব অতিব্যবহারে ধুকড়ি হয়ে গেছে, তাতে আর শীত আটকাতে চায় না। নতুন তুলো ভরে মেরামত করতে হবে সেগুলো। অমনি এঁড়ে বাছুরটাকেও বেচে আসবে হাটে। ভোররাত্রে বাছুরের দড়ি ধরে পীরপুরের হাটে রওনা দিলো সে। বেচাকেনা শেষ করে বাড়ির পথ ধরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সাধুহাটির কাছে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে খেজুরি গাঁয়ে যেতে হয়। রেল লাইনে মেরামতের কাজ হচ্ছে। সারাদিন ধরে বহু মজুর কাজ করে এখানে। এখন এই সন্ধ্যেবেলাতেও লাইনের অনতিদূরে বহু মেয়ে পুরুষ বাচ্চাকাচ্চার ভিড়। তিনকড়ি শুনেছে এরা নাকি বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলো থেকে সর্বহারা হয়ে এসেছে। সরকার খোরাক দিচ্ছে, তার বদলে মজুর খাটছে সমর্থ মেয়ে পুরুষ যারা। যে বন্যা ওদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে সেই বন্যাই পরোক্ষে ওদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মাইলের পর মাইল রেললাইন ভেঙেচুরে দিয়ে। আপাততঃ কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত এরা।

তুলোর বস্তা মাথায় নিয়ে সন্তর্পণে লাইনে নামলো তিনকড়ি। শীতের সন্ধ্যা দ্রুত অন্ধকারের আঁচল বিছিয়ে দিচ্ছে চারিদিকে। একটু দূরে শুকনো ডালপালার আগুনে রান্না চড়েছে আর তার চতুর্দিকে ক্ষুধার্ত শীতার্ত প্রাণীগুলো বসে আছে দু'চোখে উৎকন্ঠিত প্রত্যাশা ভরে। হঠাৎ চমকে থমকে থেমে গেল তিনকড়ি। সেই স্বল্প আলোকিত আলো-অন্ধকারে অতি পরিচিত অতি পুরাতন একখানা মুখ ফুটে উঠলো।

নিভন্ত আগুনে একরাশ শুকনো পাতা ফেলে ফুঁ দিতে দিতে বাতাসি বলছে, "রাত কাবার হয়ে যাবে ভাত নামতে। বলি ওরে পতিত, কাল

হাট থেকে কাঠ আনিস দিকিনি! ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চোখ গেল।"

হরিদাস বিড়িতে টান দিয়ে খুক খুক করে কেশে বিরক্ত গলায় বললো, "নবাবী রাখো, গাঁটের কড়ি দিয়ে কাঠ কেনা। কেন, চারিদিকে বনবাদাড় গাছপালার অভাব? ছেলেগুলো করে কি সারাদিন? দুটো কাঠকুটো কুড়িয়ে রাখতে পারে না ওরা?"

শুকনো পাতা পেয়ে আগুন জোর হয়েছে কিছুটা। চারিপাশে গোটা আষ্টেক মুখ উদগ্রীব হয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটার পানে। বাতাসির সংসার, বাতাসির ছেলেপুলে। এদেরই মধ্যে রয়েছে তারাও। পরান আর বদনা। তিনকড়ির সন্তান। তিনকড়ির ছেলেপুলে।

তিনকড়ি মাথার মোট সামলে নিয়ে আবার সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। খেজুরি এখনও মাইলখানেক দূরে। তুলোর গাঁঠটা হঠাৎ যেন বড় বেশী ভারী লাগতে লাগলো তিনকড়ির ----।